বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৯/৪০ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৮/১৪২৯

উন্নয়নশীল দেশের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র: একটি রূপরেখা

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ*

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে ১৯৭১ সালে, শ্রীলঙ্কায় ১৯৭৮ সালে ও নেপালে ২০১৫ সালে শাসনতন্ত্রে সমাজতন্ত্র কথাটি যোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশ, যেখানে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান, সেসব দেশের শাসনতন্ত্র বা রাষ্ট্রের মূলনীতিতে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ আছে।

মুশকিল হলো, সমাজতন্ত্র কথাটি এসব দেশে নানাভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, কিন্তু কোনোটিরই সংজ্ঞা খুব স্পষ্ট নয়। যেমন, আলজেরিয়ার শাসনতন্ত্রে ১৯৯৬ সালে 'আরব সমাজতন্ত্র' বলে নতুন ধারণা সংযোজিত হয়। এ ছাড়া লাতিন আমেরিকার ব্রাজিলসহ বেশ কটি দেশ বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে তথাকথিত 'গোলাপি জোয়ার' বা 'পিংক টাইড'-এর প্রেক্ষাপটে বামপন্থী অর্থনৈতিক নীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর মধ্যে ইকুয়েডর ও বলিভিয়ায় সরাসরি 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়েই বিপুল জনসমর্থনে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে। লাতিন আমেরিকার এই বামপন্থী ধারার রাজনীতি প্রধানত অতীতের আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক সমর্থিত কট্টর বাজার অর্থনীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছে।

শিল্পোন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর রাজনীতিতে সাধারণত ডানপন্থী ও বামপন্থী দুটি প্রধান দল বা জোট দেখা যায়। এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বামপন্থীদের একটা বড় অংশকে 'সামাজিক গণতন্ত্রী' বা 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট'-এর অবস্থান নিতে দেখা যায়। এরা তথাকথিত 'নরডিক' বা 'স্ক্যান্ডিনেভিয়ান' অর্থনৈতিক মডেলের অনুসারী, যার মধ্যে বিশেষত নরওয়েকে আদর্শ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এসব দেশে আয়-বৈষম্য সবচেয়ে কম। তবে শিল্পোন্নত দেশের সামাজিক গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়; বরং সমসাময়িক উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতির সমন্বয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করা যায় কি না, তা নিয়ে কিছু প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গোড়াতেই বলা প্রয়োজন, সনাতন আদর্শগত মতবাদ অনুসারে সম্পদের যৌথ মালিকানায় কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দেশিত যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারণা আছে, তা মূলত বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। কাজেই এ প্রবন্ধে সমাজতন্ত্র কথাটি সে অর্থে ব্যবহার করা হয়নি।[১]

---

*চেয়ারম্যান, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ ও প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রের নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে এটা তারা করেছে মূলত পূর্বের কমিউনিজম থেকে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য। এ সব দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বাজার অর্থনীতিতে রূপান্তরের বিষয়টি নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে; তবে সেটিও এ প্রবন্ধের আলোচিত বিষয় নয়।

২। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের বিবর্তনশীল ধারণা

১৯৫০-এর দশকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া কিছু দেশকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণের দিকে ঝুঁকতে দেখা যায়। গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে ভারত এর ভালো উদাহরণ। মূলত তদানীন্তন সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্প-বিজ্ঞানে দ্রুত অগ্রগতি দেখেই এ ধরনের শিল্পায়নের নীতির প্রতি এসব দেশের নীতিপ্রণেতারা আকৃষ্ট হন।[২] এই অর্থনৈতিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বেসরকারি বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর সরকারের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ এবং আমদানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও সরকারি মালিকানায় ভারী যন্ত্রশিল্প গড়ে তোলা। প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসন এ নীতির মূল লক্ষ্য হলেও পরবর্তী তিন-চার দশকে এর লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি হয়েছে খুবই ধীর গতিতে। প্রসঙ্গত, সে তুলনায় বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরপর সমাজতন্ত্রকে আদর্শগতভাবে বাহ্যতঃ অনেকটা শক্তভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, বিশেষত প্রস্তাবিত ভূমি সংস্কার ও শিল্পের সরকারি মালিকানার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভেতরে এবং বিভিন্ন স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক টানা-পোড়েন দেখা দেয় (সোবহান, ২০২২; সেন, ২০২২)। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সরকার পরিবর্তনের পর অর্থনৈতিক নীতির এ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

১৯৮০-এর দশকের শেষার্ধ থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দর্শনে বড় পরিবর্তন আসে। অর্থনীতিতে বাজারভিত্তিক ব্যাপক উদারীকরণ এবং মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নকে প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য নিরসনের চালিকা শক্তি হিসেবে দেখা হয়। ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও বৈষম্য তৈরি হয় এবং অর্থনীতিতে নানা ধরনের অস্থিরতা ও ঝুঁকি তৈরি হয়। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এই তথাকথিত কাঠামোগত সংস্কারের নীতির মূল প্রবক্তা হলেও বাস্তবে এর অনেক নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কারণে বাজারমুখী সংস্কারের বিষয়ে এখন অনেক নমনীয় অবস্থান নিচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে। আর্থিক খাতের অস্থিতিশীলতা, প্রাচুর্যের পাশাপাশি চরম বৈষম্য ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ক্রমবর্ধমান আধিপত্য এ ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতি বর্তমান কালের একচ্ছত্র প্রভাবশালী অর্থনৈতিক দর্শন হিসেবে আবির্ভূত হলেও একে ক্ষোভ ও এক ধরনের অনিবার্যতার দৃষ্টি থেকে দেখা হচ্ছে।

বিশেষত, শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় দুর্বল অবস্থানের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অনেকাংশে তাদের স্বার্থের পরিপন্থি মনে করছে (মাহমুদ, ২০২২, পৃ. ৩৭৮)। এই প্রেক্ষাপটে উন্নয়নশীল বিশ্বের কোথাও কোথাও তথাকথিত "নব্য-উদারীকরণ পরবর্তী সমাজতন্ত্র" (post-neoliberal socialism) নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে, যা প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[২] স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহরু প্রচলিত অর্থে সমাজতন্ত্রী ছিলেন না (রাও, ১৯৮৭); কিন্তু তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সতীর্থ বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ তাঁকে এ ব্যাপারে প্রভাবিত করেন। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণেতা হিসেবে মহলানবিশ দেশীয় শিল্পের বিকাশের স্বার্থে ভারী যন্ত্রশিল্পের মূল ভূমিকা নিয়ে একটি তাত্ত্বিক যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন, যা মহলানবিশ-ফেল্ডম্যান মডেল নামে পরিচিত হয়। রাশিয়ার অর্থনীতিবিদ গ্রিগরি ফেল্ডম্যান ১৯২৮ সালে একই ধরনের একটি মডেল প্রথম প্রকাশ করেছিলেন।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, যে নামেই আখ্যায়িত করি না কেন, এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নিয়ে মোটামুটি কিছু ধারণা সাধারণভাবে প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে আছে সব নাগরিকের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা, সব কর্মমুখী মানুষের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা ও ন্যূনতম জীবনধারণের জন্য সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা। এর মধ্যে সাম্য ও ন্যায্যতার বিষয়টিও থাকে, যার সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সম্পর্ক আছে। কারণ, ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান দেশ-কালভেদে আপেক্ষিক বিষয়, এটা অপেক্ষাকৃত বিত্তবানদের দৃশ্যমান জীবনযাত্রার ওপর অনেকটাই নির্ভর করে।

এ ছাড়া অর্থনৈতিক বিবেচনার বাইরে মৌলিক মানবাধিকার, ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নাগরিকদের সংগঠন করার অধিকার–এসব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এমনিতেই কল্যাণকর সমাজের কাম্য। তবে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করি না কেন, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পক্ষে বাড়তি যুক্তি হলো, একটি নিপীড়নমূলক কঠোর শাসন ব্যবস্থার তুলনায় গণতান্ত্রিক উদার পরিবেশ অর্থনৈতিক উদ্যোগের প্রণোদনা তৈরি ও বিশেষত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিকাশের জন্য বেশি সহায়ক হতে পারে (সেন, ২০০৯, পৃ. ৩৪৮)।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সাম্য ও ন্যায্যতার বিষয়টি সহজ নয় এবং এ নিয়ে ন্যায়শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। বর্তমান যুগের আমেরিকার প্রগতিশীল দার্শনিক জন রোলস (John Rawls)-এর ন্যায্যতার সংজ্ঞাটি সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্ভবত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। তাঁর শর্ত, প্রথমত, সব নাগরিকের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে; এবং দ্বিতীয়ত, সমাজের সবচেয়ে বঞ্চিত অংশকে বাড়তি সুবিধা দিতে হবে। দ্বিতীয় শর্তটি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ সুযোগ সমান থাকলেও তার সদ্ব্যবহার করার সক্ষমতা অনেকের নাও থাকতে পারে। যেমন, ন্যূনতম জীবনধারণের সংস্থান না থাকলে পরিবারের জন্য সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ কাজে লাগানো কঠিন। অমর্ত্য সেন রোলসের মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ব্যক্তির সামর্থ্য (capabilities) বিকাশের সমান সুযোগের তত্ত্ব দিয়েছেন (সেন, ১৯৯৯)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বামপন্থীরা যখন দারিদ্র্যকে কেবল বাজার ব্যবস্থার ত্রুটি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন বা ডানপন্থীরা ব্যক্তির যোগ্যতা ও উদ্যোগের অভাবকে দায়ী করেন, উভয় পক্ষই একটি বিষয় উপেক্ষা করেন। আর্থিক ব্যর্থতা ও দারিদ্র্য শুধু ভাগ্যের দোষে (তথাকথিত destiny risk) হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার নৈতিক দায়িত্ব আছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর এবং চীনের অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতি গ্রহণের পরবর্তী সময় থেকে এটা এখন পরিষ্কার, কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ও ব্যক্তি উদ্যোগকে বাদ দিয়ে অর্থনীতির সঠিক পরিচালনা সম্ভব নয়। এর প্রমাণ, সোভিয়েত রাশিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নতি করার পরও সে দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য দোকানের সামনে ক্রেতাদের দীর্ঘ সারি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য। মাও সে তুং-এর শাসনামলে চীনের ১৯৫৮-৬২ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষকেও কৃষি খাতে সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির পরিণতি বলেই গণ্য করা হয়। অন্যদিকে মুক্তবাজার ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ যে কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে, ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি তা তত্ত্ব ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। চীনে বাজারমুখী অর্থনীতি প্রবর্তনের পর আশাতীত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে বৈষম্য বেড়েছে; এমনকি কিছু কিছু ধনকুবের অতিরিক্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠার কারণে তাঁদের ক্ষমতা খর্ব করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার যুগে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দেশিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে কিছুটা কৌতুকজনক দৃষ্টান্ত আছে। দেখা যেত, সে দেশের তৈরি যন্ত্রপাতি ওজনে অতিরিক্ত ভারী হতো, তা কিন্তু যন্ত্রপাতি টেকসই করার বিষয় ছিল না। কারখানায় নানা ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি হতো বলে এগুলোর বার্ষিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা মোট ওজনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হতো। ব্যবস্থাপকেরা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার অর্জন দেখাতে বা লক্ষ্যমাত্রার বেশি উৎপাদনের কৃতিত্ব নিতে প্রয়োজনের চেয়ে ভারী যন্ত্রপাতি উৎপাদনে আগ্রহ দেখাতেন।

মোটকথা, এ যাবৎকালের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, বাজার অর্থনীতি ও ব্যক্তি উদ্যোগের অন্তর্নিহিত শক্তি অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু মানুষের হাতে এত সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে দেওয়া যাবে না, যাতে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং জনকল্যাণমুখী নীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়।

৩। সরকারের আর্থিক সামর্থ্য

বলা বাহুল্য, গণতান্ত্রিক দেশের বাজার অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে পর্যাপ্ত আয় ও সম্পদ। উন্নত গণতান্ত্রিক বিশ্বের দেশ কতখানি বামপন্থী নীতি অনুসরণ করতে পেরেছে তার প্রধান নির্দেশক হলো, জাতীয় আয় বা জিডিপির তুলনায় সরকারি রাজস্বের অনুপাত। যে নরওয়েকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আদর্শ হিসেবে ধরা হয়, সেখানে রাজস্ব আয় জিডিপির অর্ধেকের বেশি। অন্যান্য স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশের রাজস্ব আয়ের অনুপাতও এর কাছাকাছি। এর মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের জার্মানি ও ফ্রান্সকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শুধু যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র এর ব্যতিক্রম, যদিও বড় অঙ্কের ঘাটতি বাজেট দিয়ে তারাও সরকারি ব্যয়কে জিডিপির ৪০-৫০ শতাংশের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পেরেছে।

সারণি ১: জিডিপির অনুপাতে সরকারের রাজস্ব আয়, মোট ব্যয় ও বাজেট ঘাটতি (%), ২০২০

দেশ	রাজস্ব আয়	মোট ব্যয়	বাজেট ঘাটতি
নরওয়ে	৫১	৫৮	-৭
সুইডেন	৪৯	৫৩	-৪
ফিনল্যান্ড	৫২	৫৭	-৫
জার্মানি	৪৭	৫১	-৪
ফ্রান্স	৫২	৬২	-১০
যুক্তরাজ্য	৩৭	৫০	-১৩
যুক্তরাষ্ট্র	৩০	৪৬	-১৬
ব্রাজিল	২৯	৪৩	-১৪
বলিভিয়া	২৭	৩৬	-৯
ইকুয়েডর	৩১	৩৭	-৬
ভারত	১৯	৩১	-১২
নেপাল	২১	২৭	-৬
পাকিস্তান	২১	২৭	-৬
শ্রীলঙ্কা	১০	২১	-১১
বাংলাদেশ	১০	১৫	-৫

তথ্যসূত্র: বিশ্বব্যাংক, ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস।

সে তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা সরকারের রাজস্ব আয়ের স্বল্পতা। দক্ষিণ এশিয়ায় জিডিপির অনুপাতে রাজস্ব আয় শুধু ভারত আর নেপালে ২০ শতাংশের কাছাকাছি, অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে এই অনুপাত মাত্র ১০ শতাংশ বা তারও কম। এর মধ্যে শ্রীলঙ্কা জনতুষ্টিমূলক নীতি হিসেবে কর রেয়াত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় বাড়িয়ে প্রমাণ করেছে যে বিদেশ থেকে ধার করা অর্থে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ করতে গেলে দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

লাতিন আমেরিকার যেসব দেশে বামপন্থী রাজনীতির ধারা জোরদার হয়েছে, যেমন ব্রাজিল, ইকুয়েডর ও বলিভিয়া, সেখানেও রাজস্ব আয়ের অনুপাত অন্তত ৩০ শতাংশে উন্নীত করা গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ১০ শতাংশের নিচে রাজস্ব আয় দিয়ে শাসনতন্ত্রে ঘোষিত সমাজতন্ত্রের পথে বেশি দূর এগোনোর লক্ষ্যকে উচ্চাভিলাষী বলতে হবে। উল্লেখ্য, উন্নয়নশীল দেশের আদর্শ হিসেবে তথাকথিত কল্যাণ রাষ্ট্র বা 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' নিয়ে অনেক আলোচনা-গবেষণা হলেও সম্পদের যোগানের বিষয়টি অনেকটাই উপেক্ষিত থেকে যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে কম খরচের সমাধান দিয়ে সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হলেও সামাজিক খাতে সরকারি ব্যয় বাড়ানো ছাড়া টেকসই উন্নয়ন কঠিন হয়ে পড়ে (কোহলার ও চোপড়া, ২০১৪; পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের দৃষ্টান্তের আলোচনা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য)।

এত কিছুর পরও উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতি অসম্ভব নয় এবং গণতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতির সঙ্গেও তা সংগতিপূর্ণ হওয়া সম্ভব। এ রকম একটি ব্যবস্থার রূপরেখা এখানে সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। তবে এই রূপকল্প বাস্তবায়নে যে রাজনৈতিক পরিবেশ ও অঙ্গীকার দরকার, তা ভিন্ন বিষয়।

সর্বাগ্রে চিন্তা করা দরকার, কী করে সরকারের আয় বাড়ানো যায়, যাতে বাজার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ব্যক্তি উদ্যোগ ও প্রণোদনা ব্যাহত না হয়। একটা উপায় হলো, করপোরেট খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপর বাড়তি কর বসানোর পরিবর্তে ক্ষেত্রবিশেষে তাদের মালিকানার কিছু অংশ শেয়ারের মাধ্যমে সরকার অধিগ্রহণ করতে পারে। তবে অবশ্যই এটা কোনো জোরজবরদস্তির বিষয় নয় এবং ঐ সব ব্যবসা পরিচালনায় সরকারি হস্তক্ষেপের প্রশ্নই আসে না। সরকারের প্রতিনিধিরা শেয়ারের বিপরীতে কোম্পানির পর্ষদে বসলেও ভোট প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কেবল ন্যূনতম ভূমিকা রাখবেন, কাজেই এখানে সরকারি মালিকানাধীন ব্যবসায়ের ইত:পূর্বেকার তিক্ত অভিজ্ঞতায় ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। কোম্পানির উদ্যোক্তা ও পরিচালকেরাও যথারীতি শেয়ার-প্রতি মুনাফা বাড়াতে সচেষ্ট থাকবেন; সরকারের আংশিক মালিকানার জন্য সেই প্রণোদনা ক্ষুণ্ন হওয়ার যৌক্তিক কারণ নেই।

বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে নতুন কিছু নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক আর্থিক খাতের ধসের সময় বারাক ওবামা ও ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন অনেক বড় বড় আর্থিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া হওয়া থেকে রক্ষা করেছিল ঐ সময় সরকারি অর্থে কোম্পানিগুলোর শেয়ার কিনে। তবে আদর্শিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র এতই ব্যক্তি খাতমুখী যে পরবর্তী সময়ে সরকারি শেয়ারগুলো ওই সব কোম্পানিকে কিনে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এর পরিবর্তে সরকার চাইলে ওই সব কোম্পানির মালিকানার অংশ ধরে রাখতে পারত এবং মুনাফার প্রাপ্ত অংশ রাজস্ব আয়ে যোগ হতো।

তাত্ত্বিকভাবে ব্যক্তি খাতের কোম্পানির আংশিক মালিকানা থেকে রাজস্ব আয়ের সুযোগের কথা প্রথম দেখিয়েছিলেন নোবেল বিজয়ী ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জেমস মিড (মিড, ১৯৬৪)। তাঁর প্রস্তাব ছিল, স্বাধীন ট্রাস্ট গঠনের মাধ্যমে সরকারের এই আয় সামাজিক কল্যাণে ব্যয় করা যেতে পারে, যদিও তিনি নিজে এই তাত্ত্বিক ধারণাকে রাজনৈতিকভাবে বাস্তবায়নযোগ্য মনে করেননি। ব্রিটেনের লেবার পার্টির অপেক্ষাকৃত তরুণ অংশ ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে এই ধারণাকে দলের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিল, যদিও সে চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এ ধারণা বাস্তবায়নের বিশেষ সুযোগ আছে। দেখা যায়, কিছু বড় বড় শিল্প গ্রুপের মুনাফা অর্জনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান থাকলেও তারা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয়ে যায়। এর একটা কারণ, অবৈধভাবে বিদেশে মুনাফা পাচার। এক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে বারবার ঋণ পুনঃ তফসিলিকরণ, সুদ মওকুফ ইত্যাদি সুবিধা দিতে হয়। কিন্তু এর পরিবর্তে সরকার আর্থিক সহায়তার শর্ত হিসেবে মুনাফা অর্জনকারী কোম্পানিগুলোর কিছু শেয়ার 'সমমূল্যে' অর্থাৎ শেয়ারপত্রে উল্লিখিত দামে কিনে নিতে পারে। এ ছাড়া ভালো কোম্পানি বাজারে শেয়ার ছাড়লে সরকার আইন করে তার কিছু অংশও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উল্লিখিত দামে কিনে নিতে পারে।

করনীতির কিছু বড় পরিবর্তনও বিবেচনা করা যায়। আমাদের দেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে কর নেই; অথচ শিল্পোন্নত দেশগুলোতে উচ্চ হারে এ ধরনের কর আরোপ করা হয়। এমনকি অধিকাংশ স্বল্পনোন্নত দেশে সম্পদ করও নেই, বা থাকলেও তার প্রয়োগ দুর্বল। এ কারণে আমাদের দেশে বংশানুক্রমিকভাবে বৈষম্য বাড়ছে। বিশেষত যেসব ধনসম্পত্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবর্তে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, সেগুলো উৎপাদনশীল শিল্পে বিনিয়োগের পরিবর্তে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের স্থাবর সম্পত্তির ওপরই বিনিয়োজিত হচ্ছে। এ ধরনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে উচ্চ হারে কর আরোপিত হলে বাজার অর্থনীতির প্রণোদনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই।

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলোর সরকার সম্পদ আহরণের মুনাফা থেকে বড় অঙ্কের রাজস্ব আয় করতে পারে। তবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার নির্ভর করে সরকারের দক্ষতা ও শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণী চরিত্রের ওপর। মালয়েশিয়ায় ১৯৭৪ সালে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানায় পেট্রোনাস নামের তেল ও গ্যাস কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সর্বশেষ ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী, এই কোম্পানি থেকে সরকার ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমমূল্যের মুনাফা লাভ করবে। দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার ১৯৭৩ সালে 'পোসকো' নামের যে লোহা ও ইস্পাত তৈরির কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা সে দেশের শিল্পায়নে বড় ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে এই কোম্পানিতে সরকারের মালিকানা ৭০ শতাংশ, যা থেকে সরকারের বড় অঙ্কের আয় হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের খনিজ তেল উৎপাদন থেকে পাওয়া মুনাফা সে রাজ্যের বাসিন্দাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

তবে এর বিপরীত চিত্রও আছে। বিশেষত, আফ্রিকার কিছু দেশে পাশ্চাত্যের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর যোগসাজশে রীতিমতো সম্পদ লুণ্ঠন করেছে; ওই সম্পদ সাধারণ মানুষের কল্যাণে সামান্যই কাজে লেগেছে। বরং ঐ সব দেশে খনি অঞ্চলের পরিবেশ ও মানুষের জীবন-জীবিকায় কী ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়েছে তার চিত্র "ব্লাড ডায়মন্ড" নামের বিখ্যাত চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৪। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কিছু উপাদান

অর্থনৈতিক সাম্য ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার আরেকটি বড় উপায় হলো দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা। বাজার অর্থনীতির কট্টর সমর্থকদের যুক্তি হলো, স্বেচ্ছাকৃত যেকোনো অর্থনৈতিক লেনদেন বা চুক্তির ফলে দুই পক্ষই লাভবান হয়। অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকের তত্ত্বও তা-ই বলে। কিন্তু দুই পক্ষই লাভবান হলেই যে তা ন্যায্য চুক্তি, তা বলা যায় না; লাভের অংশের ভাগাভাগি নির্ভর করে দুই পক্ষের অর্থনৈতিক শক্তির ওপর। এভাবেই বাজার অর্থনীতিতে শোষণের সুযোগ তৈরি হয়। এ জন্যই ন্যায্য অধিকার বা মজুরি আদায়ে শিল্পশ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক, মৎস্যজীবী–এসব দুর্বল গোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা বাজার অর্থনীতির আদর্শের পরিপন্থি নয়। অনেকে একে সংগঠনভিত্তিক গণতন্ত্র (associational democracy) বলেও আখ্যায়িত করেছেন। ভারতের বিশ্বখ্যাত দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'আমুল' সৃষ্টি হয়েছিল গরিব দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারিদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করে মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদের শোষণ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে। অনেক ক্ষেত্রে এসব সংগঠন সাধারণের ব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন মুক্ত জলাশয় বা বনভূমি সংরক্ষণেও ভূমিকা রাখতে পারে। এসব সম্পদ ব্যক্তিস্বার্থে বা মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা কীভাবে বিনষ্ট হয়, তার ওপর 'ট্র্যাজেডি অব দ্য কমনস' শিরোনামে অনেক গবেষণা আছে। তবে এ ধরনের সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হতে পারে। বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী শ্রেণির বিরোধিতা এমনকি সরকারি সংস্থাগুলোর বৈরী মনোভাবও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় (বর্ধন, ২০০৫)। এখানেই বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা রাখার বড় সুযোগ আছে।

সুযোগের সমতা তৈরির ক্ষেত্রে সর্বজনীন মানসম্মত স্কুল শিক্ষা ও মেধাভিত্তিক উচ্চশিক্ষার অধিকার অপরিহার্য শর্ত। দক্ষিণ কোরিয়া যে আয়ের বৈষম্য না বাড়িয়েও দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছিল, তার পেছনে উন্নত মানব সম্পদের বড় ভূমিকা ছিল। বিশ শতকের শুরুতেও জাপান নিম্ন আয়ের দেশ ছিল, কিন্তু তার অর্ধ শতাব্দী আগেই জাপানে শিক্ষিতের হার ব্রিটেনের চেয়ে বেশি ছিল। দেখা যাচ্ছে, সমাজতন্ত্রের ঘোষণা না দিয়েও ন্যায্য সমাজ গঠনের কিছু উপাদান বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

কোনো একটি দেশের শিক্ষা নীতির দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। একটি হলো সর্বজনীন মানসম্মত মৌলিক শিক্ষার নীতি, যেখানে উচ্চ শিক্ষার মানের প্রতি প্রথমে তত গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অন্যটি হলো অভিজাত স্বতন্ত্র ধারার শিক্ষা নীতি, যেখানে সর্বজনীন শিক্ষাকে ততটা গুরুত্ব না দিয়ে বরং কিছু সংখ্যক বিশ্বমানের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। দক্ষিণ কোরিয়া প্রথম নীতির উদাহরণ, ভারত দ্বিতীয়টির (মাহমুদ, ২০১৪)। দুই দেশের উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এর প্রতিফলন দেখা যায়। শ্রমশক্তির জন্য উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও পণ্য রপ্তানিতে তখন থেকে ভারত অনেক পিছিয়ে। তবে সৌভাগ্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ভারত তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবা খাতের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে। তবে এর ফলে ভারতে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ তেমন তৈরি হয়নি এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিক দিয়ে তথাকথিত 'দুটি ভারতের' সৃষ্টি হয়েছে; একটি দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ আর অন্যটি উন্নত প্রযুক্তি-নির্ভর ও আধুনিক।

অর্থনৈতিক সাম্যের প্রশ্নে আমাদের মতো অর্থনীতির একটি বড় চালিকা শক্তি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার। বিনিয়োগের বাধা হিসেবে ব্যবসায় পরিবেশের নানা ত্রুটিবিচ্যুতি, বিশেষত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাই তুলনামূলকভাবে এই

বৈরী ব্যবসায় পরিবেশের বেশি ভুক্তভোগী। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা কিছু দূর পর্যন্ত ব্যবসা বাড়াতে পারলেও প্রাতিষ্ঠানিক খাতে উত্তরণের ক্ষেত্রে বড় বাধার সম্মুখীন হয়। আর্থিক ও ব্যাংকিং খাতের সুযোগ-সুবিধা থেকেও তারা অনেকাংশে বঞ্চিত। এটা যে শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা-ই নয়, অর্থনীতিতে সাম্য ও ন্যায্যতার লক্ষ্য অর্জনেও বড় বাধা। এ ছাড়া বর্ণ, গোত্র, ধর্ম ইত্যাদি দ্বারা বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থাও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সুযোগ গ্রহণে বড় বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। এটা সত্য যে, বাজার ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে না লাগিয়ে কোনো বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টেকসই হয়নি, কিন্তু বাজার একটি নৈতিকতা-অন্ধ শক্তি, যে কারণে জনস্বার্থে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনে প্রত্যেক নাগরিকের ভোট প্রয়োগের সমান অধিকার থাকে; কিন্তু বাজার ব্যবস্থায় উৎপাদন, চাহিদা ও পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় ক্রয় ক্ষমতার বৈষম্য দ্বারা। বৈষম্য কম-বেশি হলে উৎপাদন কাঠামো, জিডিপির আকার ও প্রবৃদ্ধির হিসাব—সবই ভিন্ন হবে। প্রসঙ্গত, এ কারণেই জনকল্যাণের এমনকি জীবনমানের বস্তুগত দিকের মূল্যায়নেও জিডিপি বা জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হিসাব ভালো মাপকাঠি নয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে বাজার ব্যবস্থা কতদূর সম্প্রসারিত করতে দেওয়া হবে, তা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বনভূমি বা জলাশয়ের মতো সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য সম্পদ ব্যক্তি-স্বার্থ তাড়িত বাজারের হাতে তুলে দেওয়ার বিপদ নিয়ে 'ট্র্যাজেডি অব কমনস'-এর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পানির মতো জীবন ধারণের অপরিহার্য সম্পদের বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নাগরিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে।[৩] বাজার ব্যবস্থার আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো পরিবেশের ক্ষতি ব্যক্তিগত মুনাফার হিসাব-নিকাশে আসে না, কিন্তু তা জনজীবনে বিশেষত দরিদ্র গোষ্ঠীর জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এ কারণে বাজার নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ যেমন জরুরি, তেমনি জনসচেতনতা তৈরিরও প্রয়োজন আছে। বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মুনাফার একটা অংশ জনকল্যাণে ব্যয় করবে, এ রকম একটা অলিখিত বাধ্যবাধকতা তৈরি করা প্রয়োজন।[৪] ইদানীং 'সামাজিক ব্যবসা' বা 'সোশ্যাল বিজনেস'-এর একটি ধারণাও আলোচিত হচ্ছে। এ ধরনের ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের একক লক্ষ্য ছাড়াও কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে পরিবেশ রক্ষা বা নিম্নবিত্ত মানুষের প্রয়োজনীয় পণ্য স্বল্প মূল্যে বাজারজাত করবে-এমন লক্ষ্যও ব্যবসা পরিচালনার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। সরকারি খাতের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি খাতের মুনাফামুখী ব্যবসা-বাণিজ্যের মাঝখানের পরিসরে সামাজিক ব্যবসা জায়গা করে নিতে পারে।[৫] বিখ্যাত দার্শনিক জঁ-জ্যাক রুশোর 'সামাজিক চুক্তি' বা 'সোশ্যাল কনট্রাক্ট'-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, নাগরিকদের নৈতিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব হলো পারস্পরিক আচরণের সীমারেখা মেনে নিয়ে এমন সমাজ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির কল্যাণ নিশ্চিত হবে। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যকেও আলাদা সত্তা হিসেবে এ ধরনের সামাজিক চুক্তির আওতায় আনা প্রয়োজন।

---

[৩]এই আন্দোলনের সমর্থনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০১০ সালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সুপেয় পানির প্রাপ্তি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করে পানির বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ হয়, যদিও ৪১টি শিল্পোন্নত দেশ ভোট দানে বিরত থাকে।

[৪]উন্নয়নশীল দেশে বড় কোম্পানিগুলো তথাকথিত 'করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি' খাতে তাদের মুনাফার অতি ক্ষুদ্র অংশ ব্যয় করে, বা আদৌ করে না।

[৫]এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য মাহমুদ (২০২২, অধ্যায় ৬)।

৫। উপসংহার

গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যেসব উপাদানের আলোচনা এখানে করা হলো, সেগুলো বিভিন্ন মাত্রায় কার্যকর করা সম্ভব এবং এর জন্য রাজনৈতিক বিপ্লবেরও প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে বড় কথা, এ ব্যবস্থা বাজার অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। কিন্তু এর প্রকৃত বাস্তবায়ন ভিন্ন বিষয়। সে জন্য দরকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও জনসমর্থন। তেমন সুযোগ কখন কোন দেশে কীভাবে আসবে, তা বলা কঠিন। কিছু ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক এজেন্ডা নিয়ে নির্বাচিত হওয়ার পর সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত নানা স্বার্থগোষ্ঠীর বিরোধিতা করতে গিয়ে সরকার ক্রমশ কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছে। বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসের বেলায় এমনটিই ঘটেছে।[৬] এটাও বিবেচনার বিষয়, যে কোনো একটি রাজনৈতিক দল এ ধরনের অর্থনৈতিক এজেন্ডা নিয়ে ক্ষমতায় এলেও পরবর্তী নির্বাচিত সরকার তেমন আদর্শে বিশ্বাসী না-ও হতে পারে। তবে জনকল্যাণমুখী কিছু পদক্ষেপ একবার কার্যকর হলে এবং তার পক্ষে বিপুল জনসমর্থন থাকলে পরবর্তী সরকারের পক্ষে তা পুরোপুরি নাকচ করে দেওয়া কঠিন। আধুনিক কালের রাজনীতি ও অর্থনীতির সব দর্শন এসেছে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে। কে জানে, পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির চলমান সংকটের প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক কল্যাণমুখী বাজার অর্থনীতির নতুন আদর্শ হয়তো উন্নয়নশীল দেশ থেকেই আসবে, যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ অনেক বেশি।

গ্রন্থপঞ্জি

Artaraz, K. (2012). *Bolivia: Refounding the nation*. Pluto Press.

Bardhan, P. (2005). *Scarcity, conflicts and cooperation: Essays in the political and institutional economics of development*. Cambridge, MA: MIT Press.

Koehler, G., & Chopra, D. (2014). *Development and welfare policy in South Asia*. Abingdon, U.K.: Routledge.

Mahmud, W. (2014). Beyond education for all: Meeting the human resource needs of economic development. IGC Working Paper, International Growth Centre at London School of Economics, February 2014 (https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2014/08/Mahmud-2014.pdf).

Mahmud, W. (2022). *Markets, morals and development*. Abingdon, UK: Routledge.

Meade, J. (1964). *Efficiency, equality and the ownership of property*. London: Allen and Unwin.

Rao, V. V. (1987). Socialist thought of Jawaharlal Nehru. *The Indian Journal of Political Science*, *4*(2) (April-June).

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.

[৬]ইভো মোরালেস প্রচুর জনপ্রিয়তা নিয়ে ২০০৬ সালে বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, কিন্তু ২০১৯ সালে বিরোধীদের দাবিতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন (আরতারাজ, ২০১২)।

Sen, A. K. (2009). *The theory of social justice*. London: Allen Lane.

Sen, B. (2022). Bangabandhu's democratic socialism some reflections. In Proceedings of the international conference on fifty years' journey of Bangladesh, *Genocide Nation-State and Bangabandhu's Cherished Bangladesh*, (ed.) Mamun, Muntasir, Khulna: Genocide-Torture Archive and Museum Trust.

Sobhan, R. (2022). *Untranquil recollections from dawn to darkness: Political economy of nation building in post-liberation Bangladesh*. Dhaka: University Press Ltd.